নবুওয়াত মানবতাকে কী দিয়েছে?

ما ذا قدمت النبوة للبشرية

< بنغالي >

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

السيد أبو الحسن علي الندوي رحمه الله

অনুবাদক: মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ترجمة: محمد زين العابدين

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

নবুওয়াত মানবতাকে কী দিয়েছে?

মানবতার সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও দলের সংখ্যা প্রচুর। ইতিহাসে এমন মানুষের সংখ্যাও অনেক যারা পৃথিবীর নির্মাণ ও উন্নতি সাধনে অকাতরে শ্রম দিয়েছেন। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যায় অগণিত, অসংখ্য মানুষ এসে ভীড় করেছে এবং নিজেদেরকে মানবতার সেবক ও নির্মাতা হিসাবে দাঁড় করাতে যারপরনাই চেষ্টা করেছে। তারাও মানবতার সেবা ও নির্মাণের মাপকাঠিতে বিবেচিত ও উত্তীর্ণ হতে চায়। আমরাও বলি পৃথিবী ও মানবতার তাদের সমূহ চেষ্টা-অবদান বিচার করে দেখা দরকার। সূক্ষ্ম নিক্তিতে মেপে দেখা দরকার, মানবতার নির্মাণ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের মাপকাঠিতে পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে কে?

প্রথমেই ভাবতে হয় চিন্তাবিদ দার্শনিকদের কথা। পরম গাম্ভীর্য আর শ্রদ্ধাস্নাত এ কাফেলাটি রীতিমতোই সম্মানিত হয়ে আসছে যুগে যুগে মানব সভ্যতার। বড় বড় গ্রীক দার্শনিক আর ভারত বর্ষের নামী-দামী জ্ঞান-গুরুদের ছোঁয়ায় এ কাফেলা বরাবরই ছিল অনন্য-বরেণ্য। দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি দুর্বলচিত্ত আমরা এ কাফেলার প্রতি চোখ তুলতেই আরেকবার নড়ে উঠি। অবলীলায় বলে উঠি, এরাই মানব জাতির মাথা উঁচু করেছে। মানবতার উভয় হাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মণি-মুক্তায় পূর্ণ করে দিয়েছে। অথচ আমরা যদি একবার এক দিকদর্শিতা আর নিজস্ব লালিত বিশ্বাসের গণ্ডিমুক্ত হয়ে ভাবি এবং চিন্তা করি, আচ্ছা বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের এ কাফেলাটি কি মানবতার জন্য বিশেষ কোনো করুণা হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে? মানব সভ্যতার জন্য এ গোষ্ঠীকে কি রহমত বলা যায়? আচ্ছা জিজ্ঞেস করি মানবতা তাদের কাছে কী পেয়েছে? মানবতার কোন তৃষ্ণা নিবারণ করেছে এ কাফেলা? মানবতার কোন যন্ত্রণার চিকিৎসা করেছে এ জ্ঞান গুরুর দল-দার্শনিক কাফেলা?

আমরা এ সব প্রশ্ন নিয়ে যতই ভাবি শূন্যতা আর দৈন্যতা ছাড়া কিছুই খোঁজে পাই না। কেবল পাই সাগর সাগর নৈরাশ্য। আপনি নিজেই দর্শন শাস্ত্র পড়ুন। দার্শনিকদের জীবপাতাগুলো উল্টে দেখুন! মনে হবে দর্শনের জীবন সমুদ্রে ছোট একটি দ্বীপ ছিল। কিছু রক্ষিত জায়গা ছিল। সীমানা পাতা ক্ষুদ্র একটি এলাকা ছিল। জ্ঞানগুরু-দার্শনিকরা আল্লাহ প্রদত্ত তাদের সকল শক্তি ও মেধা সেই ছোট ক্ষুদ্র রক্ষিত ভূমিতেই শেষ করে দিয়েছেন।

মানবতার যে সব চাহিদা ছিল আশু পূরণীয়, সেসব সমস্যাকে এক মুহূর্তের জন্যেও রেখে দেয়া যায় না, সেসব সমস্যার গ্রন্থি উম্মোচন ব্যতিরেকে মানবতার গাড়ি এক পা এগুতে পারে না, জ্ঞান-গুরু দার্শনিকরা সে সব সমস্যার প্রতি একবারও চোখ তুলে তাকান নি। এ সব সমস্যা উত্তরণে মানবতাকে সহায়তা করা তো অনেক পরের কথা, এসব সমস্যা নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা বা পর্যালোচনাও হয় নি। হয় নি কোনো বাক-বিতণ্ডা। তারা বরং তাদের সেই জ্ঞানভূমিতে, চিন্তা ও দর্শনের দ্বীপ-রাজ্যে নিরাপদ শান্তিময় জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু মানবতা তো আর সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাজ্যে বন্দি থাকে নি। দার্শনিকদের আবাদভূমি গ্রীকেও তো অদার্শনিক কম ছিল না। এ দার্শনিকগণ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে খুব ভেবেছেন। নক্ষত্রের বিচরণ পথ, আকাশ-মণ্ডলী আরো কত কিছু নিয়ে মাথা ক্ষয় করেছেন; কিন্তু অদার্শনিকদের ওসব বিষয়ের সাথে কী সম্পর্ক? তা ছাড়া মানবতাই বা এসব থেকে কি পেয়েছে? মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা এসব দিয়ে কতটুকু উপকৃত হয়েছে? উদভ্রান্ত, পথহারা, ম্রিয়মাণ মানবতার জন্য তারা কী করেছেন? তারা জীবন যাপন করেছেন অথচ জীবনের সাথে তাদের যেন কোনো সম্পর্কই ছিল না।

জীবনের চার পাশে জ্ঞান ও দর্শনের প্রাণহীন দেয়াল দিয়ে রেখেছিলেন তারা। সম্পর্কে যা ছিল কেবল দর্শনের কয়েকটি কেতাবী কথা।

এখন চলছে রাজনীতির যুগ। সর্বত্রই রাজনৈতিক হৈ-চৈ। আমাদের দেশ এখন স্বাধীন। আশা করি এ উপমাটি দার্শনিকদের অবস্থা ও ভূমিকা নির্ণয়ে সাহায্য করবে। আপনারা সকলেই জানেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন দেশের দূতাবাস রয়েছে। কোনটা আমেরকিকার দূতাবাস, কোনটা রাশিয়ার, কোনটা ভারতের আবার কোনটা ইরানের। এ সব দূতাবাসের ভিতরেও মানুষ আছে। জীবন যাপন প্রাণচাঞ্চল্য সবই আছে। সেখানে তারা খাওয়া-দাওয়া করে, পড়াশুনাও করে। অনেক বড় বড় শিক্ষিত, কুটনীতিবিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষকের নিবাস এ দূতাবাসগুলো। অথচ আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ের সাথে এদের সম্পর্ক নেই। আমাদের পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদের সাথেও তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের দারিদ্র, ঐশ্বর্য, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি-অবনতি নিয়েও তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই; বরং তাদের নির্ধারিত কিছু কাজ আছে, তাও সীমিত অঙ্গনে। তারা কেবল সেই কাজ নিয়েই ব্যস্ত। তাই তারা আমাদের দেশে থেকেও যেন নেই। দর্শনের বিষয়টিও ছিল অনুরূপ। জ্ঞান-গুরু দার্শনিকরা সেই দূতাবাসের বদ্ধ নিবাসে বসে জ্ঞান চর্চায় মগ্ন থাকতেন। জীব-যুদ্ধের সাথে তাদের তেমন সম্পর্কই ছিল না।

দার্শনিকদের পরেই আসে কবি সাহিত্যিকদের পালা। কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি আমাদেরও ঝোঁক আছে। তাই আমরা কাব্য ও সাহিত্যকে খাটো করে দেখছি না। তবু আমি বলতে বাধ্য, কবি সাহিত্যিকরাও মানবতার ব্যথা দূর করতে সচেষ্ট হন নি। মানবতার দীর্ঘ যন্ত্রণা আর ভয়াল জখম বেদনার চিকিৎসা না করে তারা আমাদেরকে দিয়েছেন কিছু বিনোদন মাত্রা আর অবসর কাটানোর নিস্ফল সওদা। সন্দেহ নেই তারা আমাদের সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু মানবতার ব্যথায় বিমূঢ় হয় নি তাদের মাথা। মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের চিন্তা করতে পারেন নি তারা। আর এটা তাদের সাধ্যাতীতও বটে।

জীবনের উত্থান পতন হয়েছে। মানবতা ভেঙ্গেছে-গড়েছে। আর কবি সাহিত্যিকরা বসে বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়েছেন। এর উদাহরণ হল এমন, মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় নিপতিত। কেউ জ্বলছে, কেউ যুদ্ধ করে মরছে। আরেকজন বাঁশীওয়ালা মিষ্টি সুরে বাঁশী বাজাচ্ছে আর হাটছে। হতে পারে লড়াকু যোদ্ধা আর অসুস্থ জনেরা তার সুরে কিছুটা হলেও আমোদিত হবে। ভাবের ভোগে শরীক হবে। কিন্তু তার সেই সুরমুর্ছনায় জীবনের সমস্যা তো পার হবে না। অধিকন্তু তার সুরে সমস্যার জট খোলার কোনো নির্দেশনাও নেই। তবুও আমাদের জীবন সাহারায় কাব্য ও সাহিত্যের প্রয়োজন আছে। আমাদের আত্মা ও বিবেক শানিত করি। প্রাণিত করি কাব্য-সাহিত্যের ছোঁয়ায়। কিন্তু এতে জীবন সমস্যার তো সমাধান হচ্ছে না। রক্তাক্ত জীবন-যুদ্ধের দাওয়া তো এখানে নেই। আর আমাদের কবি সাহিত্যিকরাও কোনো বিষয়ে কখনো চাপাচাপি করেন না। বিশেষ কোনো লক্ষ্য ও টার্গেটে তারা সংকল্পবদ্ধ হন না। তাই সে জন্যে জীবন-পণ লড়াই তাদের করতে হয় না। তা ছাড়া লড়াই সংগ্রাম তাদের নাগালভুক্তও নয়। অথচ সংগ্রাম ও যুদ্ধ ছাড়া কোনো সংস্কার বা বিপ্লব হতে পারে না। এ কারণেই সংস্কার ও সংগ্রামের ইতিহাসে কবি-সাহিত্যিকদের পদচারণা তেমন একটা নজরে পড়ে না।

তৃতীয় পর্যায়ে আমরা ভাবতে পারি বিজয়ী বীরদের কথা। যাদের তরবারির আঘাতে ঝরে পড়ে যায় পতাকা, খান খান হয়ে যায় সিংহাসন। যারা দেশের পর দেশ জয় করে সৃষ্টি করেন ইতিহাসের নতুন ধারা এবং স্বাভাবিকভাবেই আমরা এ বিজয়ীদের প্রতি অনেকটা দুর্বল থাকি। তাদের তরবারির ঝনঝনানি যেন আজও আমাদের কানে বাজে।

বাহ্যত তাদের চিৎকার শুনে মনে হয়, তারা মানবতার জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু তাদের ইতিহাস কি তাই বলে? তাদের ইতিহাস কি ন্যায় ও ইনসাফের ইতিহাস, না ত্রাস ও নারকীয়তার ইতিহাস? আলেকজান্ডারের নাম শোনাতেই মানুষের স্মৃতিপটে ভেসে উঠে তার নির্যাতনের বর্বর কাহিনীগুলো। তাই কোনো ক্রমে তাদের মানবতার বন্ধু হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। আলেকজান্ডার তো গ্রীস থেকে ভারত পর্যন্ত দেশের পর দেশ উলট পালট করে দিয়েছিল। শত দেশ শত জাতি তার অত্যাচারে যাবতীয় শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে হয়েছিল বঞ্চিত। তার মৃত্যুর হাজার বছর পরও পতিত নির্যাতিত জাতিগুলো উঠে দাঁড়াতে পারে নি। তা ছাড়া চেঙ্গিস খানদের অবস্থাও এর থেকে ভিন্ন নয়। পৃথিবীর খ্যাতনামা অন্যান্য বিজয়ীরাও অনুরূপ জীবনধারায় ছিল অভ্যস্ত। তাই বিজয়ী যোদ্ধারা হতে পারে স্বীয় দেশ ও জাতির জন্য বন্ধু বরং পরম বন্ধু। কিন্তু অন্যদের জন্য নিঃসন্দেহে আগ্রাসন ও বিপদ।

চতুর্থ পর্যায়ে আমরা ভাবতে পারি সেই সব সংগ্রামী জীবন যোদ্ধাদের কথা, যারা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। এদের কথা ভাবতে গেলে শ্রদ্ধায় অবনত হই আমরা। সন্দেহ নেই তারা আমাদের মাতৃভূমির জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যারা অন্য দেশের বাসিন্দা তাদের জন্য কি করেছেন তারা?

আপনি নিশ্চয় আব্রাহাম লিংকনের নাম শুনেছেন। আধুনিক আমেরিকার স্থপতি তিনি; কিন্তু তিনি ভারত, মিশর, ইরাকসহ অন্য দেশের জন্য কী করেছেন? সন্দেহ নেই আমেরিকাকে এক নম্বর সুপার পাওয়ার হিসাবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি; কিন্তু বিশাল পৃথিবীর জন্য গোলামি ও দাসত্বের নব শৃঙ্খল কি সৃষ্টি হয় নি এতে? সা'দ যগলুলের কথাই ভাবুন! তিনি মিসরবাসীর জন্য এক আশীর্বাদ পুরুষ। মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু মিসরীয়দের জন্য তো তিনি কিছুই করতে পারেন নি। মূলত: এ জাতিপূজা স্বদেশের জন্য আশীর্বাদ হলেও অন্য দেশ ও জাতির জন্য এক মহা বিপদ। কারণ, জাতিপূজা আর জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণাটাই হলো, নিজের জাতির মাথা উঁচু করা আর অন্য জাতির মাথা নীচু করা। এ প্রেরণা ও বাসনা পূরণ করার লক্ষ্যে স্বীয় জাতির মাথা উঁচু করতে গিয়ে অনেক জাতিকে দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ করতে হয়। এমনকি নিজেও সেই জাতির দাসত্ব মেনে নেয়। এ কথার সাথে কারো দ্বিমত নেই।

পঞ্চম পর্যায়ে আমরা ভাবতে পারি আধুনিক বিজ্ঞানী ও আবিস্কারকদের কথা। নিঃসন্দেহে তারা জাতিকে অনেক নতুন নতুন বিষয় উপহার দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় অনেক অভিনব আসবাবপত্র আবিস্কার করেছেন। তাদের এ সেবা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ, তাদের এ সব আবিস্কার মানবতার জন্য উপকারী। বিদ্যুত, বিমান, রেডিও তাদেরই অবদান। এ জন্যে তাদের অনেক শ্রম দিতে হয়েছে এবং মানুষ এসব আসবাবপত্র দিয়ে প্রতিনিয়ত আমোদিত-আস্বাদিত হচ্ছে। তারপরও একবার ভেবে দেখুন, শুধু এ সব আবিস্কারই কি মানব ও মানবতার জন্য যথেষ্ট? এ সব আবিস্কারের সাথে যদি সদিচ্ছা না থাকে, ধৈর্য ও সংযম না থাকে, সৃষ্টির প্রতি দরদ ও আন্তরিকতা না থাকে, সেবার মনোভাব না থাকে, আর যদি এর দ্বারা মানবতার মৌলিক সমস্যা ও চাহিদার সমাধান না হয়, তাহলে আপনিই বলুন, এ সৃষ্টি মানবতার জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ?

আমাদের বিজ্ঞানীরা মানবগোষ্ঠীকে নতুন নতুন অনেক কিছু দিয়েছে; কিন্তু সেগুলো ব্যবহারের সঠিক চেতনাটা দিতে পারে নি। এ নব্য আবিস্কারকে কাজে লাগাবার মত মন ও অনুভূতি দিতে পারে নি তাদেরকে। এ সব সৃষ্টি ব্যবহার করে অনাসৃষ্টির সম্ভাব্য পথ পরিহার করার পরামর্শ ও শিক্ষা দিতেও দৈন্যের পরিচয় দিয়েছে আমাদের বিজ্ঞানীরা।

ইতোমধ্যে আমরা দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি। আধুনিক আবিস্কারের জঘন্য ব্যবহারের প্রদর্শনী আমাদেরকে অনেক অভিজ্ঞতা দিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, চারিত্রিক প্রশিক্ষণ আর আল্লাহ প্রীতি ছাড়া আধুনিক আবিস্কার ও সৃষ্টি শুধু অভিশাপই নয়- মানব ও মানবতার জন্য এক মহাত্রাস, ভয়ানক 'আযাব।

আমি কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীদের ছোট করে দেখছি না, আমি বরং বলছি, এসব আবিস্কার ও সৃষ্টির সাথে সুচিন্তা, শুভলক্ষ্য, সুন্দর চরিত্র ও নিয়ন্ত্রিত বিবেক-বুদ্ধির সমন্বয় দরকার। যদি এ সবের সমন্বয় ছাড়া সৃষ্টি ও আবিস্কার হয় তাহলে সেটা হবে অসম্পূর্ণ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ভিতরে সদিচ্ছার উদয় না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সুন্দর ও মঙ্গলজনক কাজ করতে তাদের নিজেদের মধ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাবে না, শত উপায়-উপকরণ, অজস্র সুযোগ-সুবিধা তাদেরকে সৎ ও সাধু বানাতে পারবে না। মনে করুন আমার কাছে দেওয়ার মত অর্থ আছে। নেওয়ার মত অসহায় মানুষও আছে অনেক। আমাকে বাধা দেওয়ার মত কেউ নেই; কিন্তু আমার মধ্যে দান করার মত প্রেরণা ও আগ্রহ নেই। তাহলে আমাকে দান করতে, অসহায়কে সাহায্য করতে কে উৎসাহিত করবে?

এ সবের বাইরে আরেকটি **মানব কাফেলা** আছে। তারাও আমাদের মতো মানুষ। তারা আল্লাহ তা'আলার নবী। তাঁর নির্বাচিত দূত কাফেলা। তারা কখনো নিজেদের আবিস্কারক বা বিজ্ঞানী বলে দাবী করেন না। তারা নিজেদেরকে জ্ঞান-গুরু হিসাবেও দাবী করেন না। কবি-সাহিত্যিক হিসাবেও গর্ব নেই তাদের। তারা নিজেদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেন না। আবার অনর্থক নিজেদেরকে খাটোও করেন না। তারা বরং অত্যন্ত বলিষ্ঠ, সহজ ও সরল ভাষায় বলে দেন, তারা এ পৃথিবীতে তিনটি বিষয় প্রদান করেন।

এক. বিশুদ্ধ জ্ঞান

দুই. সেই জ্ঞানের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস

তিন. সেই জ্ঞান ও বিশ্বাস মুতাবিক জীবন-যাপন করার অমিততেজ অনুপ্রেরণা।

এই হল নবী আদম আলাইহিস সালাম থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী রাসূলের শিক্ষার সার সংক্ষেপ।

এ পর্যায়ে আমি সেই জ্ঞানের কথা বলতে চাই, নবী ও রাসূলগণ মানবজাতিকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেন। হ্যাঁ, তাঁরা মানবজাতিকে এ কথাই শিক্ষা দেন, এ পৃথিবীকে কে বানিয়েছেন? কেন বানিয়েছেন?

নবীর কথা হলো, প্রথমেই আমাদের জানতে হবে, আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? আমাদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যই বা কী? এ সব জিজ্ঞাসার সমাধান করেই আমাদেরকে এগুতে হবে। নইলে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই হবে ভুল। আমাদের সকল প্রচেষ্টাই হবে বৃথা। অধিকন্তু এ সব প্রশ্নের উত্তর না জেনে এ পৃথিবীকে, এ পৃথিবীর একটি পরমাণুকেও কাজে লাগাবার, ব্যবহার করার অধিকার নেই আমাদের।

কারণ, এ পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম-কাণ্ড, বচন-উচ্চারণ, খানা-পিনা, উঠা-বসা এ পৃথিবীরই একটি ক্ষুদ্র অংশ। সুতরাং এ বিশাল বিশ্ব সম্পর্কে যখন আমি কিছুই জানব না, এর মূল নিয়ামক ও পরিচালক শক্তি সম্পর্কে আমি থাকব অজ্ঞ। অধিকন্তু এ নিখিল ভুবন সৃষ্টির মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথেও যখন আমার একাত্মতা নেই, তখন এ পৃথিবীর কোনো কিছু থেকেই উপকৃত হবার, আস্বাদিত-আমোদিত হওয়ার অধিকার আমার নেই। এ বিশ্ব নিয়ন্তার উপলব্ধি ও তার বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য না জেনে আমি একটি রুটির গায়েও আঙ্গুল বসাতে পারি না। আমি

যেভাবে এ বিশাল দুনিয়ার একটি অংশ, এ রুটির একটি টুকরোও এ বিশাল পৃথিবীর একটি অংশ। শুধু তাই! আমরা এ পৃথিবী নামক যে গ্রহটিতে অবস্থান করছি এটাও সেই বিশাল জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ।

আচ্ছা বলুনতো, গ্রহ-নক্ষত্রের বিশাল জগতে আমাদের এ পৃথিবীটার কী দাম আছে? গ্রহ-নক্ষত্রের বিশাল রাজ্যে আমাদের এ পৃথিবীর গুরুত্বের কথা জানতে পারলে আপনি সত্যিই লজ্জা পাবেন। শুধু ছোট একটি সূর্যের তুলনায় আপনার এ পৃথিবীটাকে একটু মেপে দেখুন। আর আপনার এ মহান দেশ! আচ্ছা, এটাকে কি কোনো তুলনায় আনা যায়? এবার বলুন এ বিশাল জগত সম্পর্কে আপনার মত ক্ষুদ্র সত্তাকে কে অবহিত করল? কার মহিমায় এ বিশাল রাজ্যের সাথে আপনার সম্পর্ক গড়ে উঠল? নিশ্চয় এ বিশ্ব জগতের স্রষ্টার অনুগ্রহে এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্যের খাতিরেই তো পরিচয়ের এ সেতু। অথচ এ মহান সৃষ্টিকর্তাকে যদি আপনি না জানেন কিংবা না মানেন, তার দেওয়া জীবন লক্ষ্যই যদি আপনার মনপূত না হয় তাহলে তাঁর জগতের ক্ষুদ্র একটি দানা-পানি কি আপনি ব্যবহার করতে পারেন? সেই অধিকার কি আপনার আছে?

আমি জানতে চাই, আপনার হাতে খাবারের যে টুকরা আছে, এ টুকরাটি যদি আপনাকে প্রশ্ন করে বসে এবং বলে, হে মানব! আমিতো তোমার সৃষ্টিকর্তাকে চিনি এবং তার আদেশ মাফিক তোমার তরে আমি আমার অস্তিত্বকে বিলীন করে দিচ্ছি; কিন্তু তুমি! তুমি তো তোমার সৃষ্টিকর্তাকে জানো না। তাঁর বন্দেগিও কর না। তাহলে তুমি কোন অধিকারে আমাকে ভোগ করবে? বলুন, তখন আপনি কী জবাব দেবেন?

শুধু খানা-পিনাই নয়, পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু ব্যবহারের সময়ই এ কথা ভাবতে হবে -এর সৃষ্টিকর্তা কে? কেন সৃষ্টি করেছেন তিনি এটা?

কিন্তু এক আজব ট্রাজেডি। আজ পৃথিবীর সকল কাজ চলছে। বাজারে প্রাণ-চাঞ্চল্যের তরঙ্গায়িত প্লাবন। যোগাযোগ সম্পর্ক গড়ে উঠছে-বৃদ্ধি পাচ্ছে নিয়ত। গাড়ি চলছে, বাড়ি গড়ছে, চলছে কল-কারখানা। অথচ কারোরই এ কথা জানবার অবসর নেই, আচ্ছা -এতো কিছু যে হচ্ছে এগুলোর সৃষ্টিকর্তা কে? আর কেন-ই বা তিনি এত কিছু বানালেন?

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ পৃথিবীতে আগমন করেন, তখনও মানবতার গাড়ি চলছিল। তবে লক্ষ্যহীন। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক, বিজেতা, শাসক, কৃষক এবং ব্যবসায়ী সকলেই ছিল প্রচন্ড ব্যস্ত। কারোরই মাথা উঠাবার সুযোগ ছিল না। আপন পেশা ও কর্মে যেন উবু হয়ে পড়ে আছে সকলে। তখন শাসকও ছিল, শাসিতও ছিল। অত্যাচারী ছিল, অত্যাচারিতও ছিল। কিন্তু তারা জানতো না কে তাদের সৃষ্টি করেছেন। তারা খোঁজে দেখে নি কেনই বা এ পৃথিবীতে তাদের আগমন। এ অজ্ঞ, লক্ষচ্যুত মানবগোষ্ঠীর কাছেই একজন বিশাল মানবের আগমন হয়। তিনি এসে মানবতার পতাকাবাহীদের জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা বলতো, তুমি মানব জাতির প্রতি কেন এ অত্যাচার করেছো? তাদেরকে প্রভুর সন্ধানটি পর্যন্ত দাও নি। সারা জাহানের বাদশাহর দরবার থেকে টেনে এনে নিজের গোলাম বানিয়ে রেখেছো। কোন অধিকারে তুমি অপূর্ণ কিশোর মানবতাকে অন্যায় পথে তুলে দিয়েছ? হে অত্যাচারী ড্রাইভার! তুমি যাত্রীকে জিজ্ঞেস না করেই কোন দিকে জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়েছ?

তিনি মানবতার হৃদয়ে দাঁড়িয়ে জানতে চায়, চিৎকার করে ডাক দেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দেয়ার উপায় নেই। পাশ কাটাবার পথ নেই। তাঁর এ চিৎকার শুনে মানুষ দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। অন্যদল অস্বীকার করে। অবশ্য এ দু'টি ভিন্ন তৃতীয় কোনো পথ নেই।

নবীগণ কখনো এ কথা বলেন না, আমি কোনো গুপ্ত ধনের সন্ধান নিয়ে এসেছি। মানুষের শক্তিকে জাদুর কাঠি বুলিয়ে কাবু করবার মতো কোনো চমকও তাদের দেখান না। নতুন কোনো আবিস্কারও তাদের শ্লোগানের অন্তর্ভুক্ত হয় না। ভূগোল কিংবা খনিজ সম্পদ বিষয়ে বিশেষ কোনো দক্ষতার দাবীও তাঁরা করেন না। তাঁরা বরং বলেন, আমরা এ বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে মানুষকে সঠিক ও যথার্থ ধারণা দেই -তাঁর দেওয়া জ্ঞানের আলোকেই এবং আমাদের মাধ্যমেই তাকে খোঁজে পাওয়া সম্ভব।

তারা আরো বলেন: এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একজন। তাঁরই আদেশ ও ইচ্ছাকল্পে এ পৃথিবী চলছে। এ পৃথিবীর শাসন ও সৃষ্টিতে তাঁর কোনো শরীক নেই। এ পৃথিবীকে লক্ষ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেন নি তিনি এবং এর যাত্রাও উদ্দেশ্যহীন নয়। এ জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে। সেই জীবনে এ জীবনের হিসাব নেওয়া হবে। সেখানে ভালো কর্মের পুরস্কার আর মন্দ কর্মের শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আইন ও বিধান যারা নিয়ে এসেছিলেন এবং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ বলে দেন তাঁরাই নবী, তাঁরাই রাসূল। তাঁরা সকল দেশে সকল জাতির কাছে একই আহবান নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের নির্দেশনা ব্যতীত কেউ আল্লাহ তা'আলার পথ অতিক্রম করতে পারে না। তাঁদের এ আহ্বান এ নির্দেশনা শাশ্বত। তাদের মত ও পথে কোনো বিরোধ নেই, দ্বিমত নেই। অথচ দু'জন দার্শনিক কোনো একটি বিষয়ে একমত হতে পারেন না।

তবে জানা থাকলেই যে বিশ্বাস থাকবে এমনটিও আবশ্যক নয়। আমরা আজকাল কত কিছুই তো জানি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কত ক্ষীণ, কত দুর্বল। জ্ঞান সবক্ষেত্রেই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে না। প্রাচীনকালে কত দার্শনিক জীবনভর একমুঠো বিশ্বাস জমাতে পারে নি। এ সভ্য যুগেও সন্দেহের ব্যাধিতে আক্রান্তদের সংখ্যা কম কোথায়? কিন্তু নবীগণ শুধুমাত্র জ্ঞান দান করেই ক্ষ্যান্ত হন না, সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসও সৃষ্টি করেন। কারণ, জ্ঞান অবশ্যই বড় সম্পদ। কিন্তু তার চাইতেও বড় সম্পদ হল, বিশ্বাস। যে জ্ঞানে বিশ্বাস নেই সে জ্ঞান শুধু জিহ্বার অলংকার, মন মগজের বিলাসপত্র আর অন্তরের ভণ্ডামি মাত্র। এ সব পঙ্কিলতার বহু উর্ধ্বে ছিলেন নবীগণ। তাঁরা সর্বদাই স্বীয় অনুসারীদের ইলম ও জ্ঞানের পাশাপাশি দান করেছেন অসীম বিশ্বাস। তাঁরা যা কিছু জেনেছেন সে অনুযায়ী কাজও করেছেন। প্রয়োজনে সেই জ্ঞানের আলোকে জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হননি তাঁরা। জ্ঞান তাঁদের মন মগজে আলো বিচ্ছুরণ করত। তাঁদের হৃদয়কে করত অগাধ সাহসী ও শক্তিমান। তাঁদের সেই সাহস ও শক্তির কাহিনী আজ আমাদের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আমাদের পুরনো ইতিহাসের সোনালী অংশ। তাঁদের পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর দিকে তাকালেই আমরা তাঁদের সেই জ্ঞান ও বিশ্বাসের স্বাক্ষর দেখতে পাই।

আজ পৃথিবীতে বিশ্বাস নেই বলেই বিশ্ব জুড়ে অপরাধের এ সয়লাব। কারণ, যদি বিশ্বাস থাকত তাহলে অন্যায় অবিচারের এ তুফান বইতো না। সমাজের সর্বত্র ঘুষ ও সূদের তান্ডব হতো না। এসব অপরাধ অজ্ঞানতার কারণে হচ্ছে এমনতো নয়। কারণ চুরি করা অপরাধ এটা কে না জানে? সূদ হারাম এটাতো সকলেরই জানা। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা অন্যায়, এটা কার অজানা? জানে সকলেই; কিন্তু বিশ্বাস নেই। আমরা বরং লক্ষ্য করছি, যেখানে জ্ঞানের প্রতিযোগিতা তুঙ্গে সেখানেই অপরাধের বাজার বেশি গরম। যারা সূদের অপকারিতা জানে, এ বিষয়ে বই

লিখেছে তারাও সুদ গ্রহণে অগ্রণী। বার বার ছিনতাই ডাকাতির শাস্তি ভোগ করার পরও ডাকাতিতে লিপ্ত হয়। বার বার জেল খাটার পরও তারা অপরাধে লিপ্ত হয়। অপরাধ ও তার শাস্তি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ নয়। অথচ তারা আপন পথে অবিচল।

তাই যদি বিদ্যাটাই যথেষ্ট হতো তাহলে একবার চুরির শাস্তি ভোগ করার পর আর চুরি করার কথা ছিল না। অথচ শাস্তি ভোগ করার পরও অপরাধী অপরাধ ছাড়ছে না। এতেই প্রমাণিত হয়, শুধু জানাটাই যথেষ্ট নয় জ্ঞানের সাথে বিশ্বাসের মিলন অপরিহার্য।

জ্ঞান আবশ্যক। সেই জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসও আবশ্যক। কিন্তু জানার সাথে বিশ্বাসের মিলন হলেই কি তা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে? অনেক ক্ষেত্রেই তো এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। কত লোক আছে যারা জানে মদ পান করা ভাল নয়। এর যে সব ক্ষতি আছে তার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস আছে। অথচ মদ পান করে যাচ্ছে রীতিমত। ধুমপান ক্ষতিকর। এটা জানে সকল লোক। বিশেষ করে চিকিৎসকরা তো ভালো করেই জানে। অথচ ধুমপায়ী ডাক্তারের সংখ্যা কি খুব নগণ্য?

আসল কথা হল, অন্যায় ত্যাগ করার মনোভাব ও স্পৃহা থাকতে হবে। দেখা যায়, অপরাধের নেশাকে জানা সত্ত্বেও পরাজিত করতে পারছে না অনেকেই। নবীগণের এটাও একটা স্বতন্ত্র অবদান। তারা জ্ঞান ও বিশ্বাসের পাশাপাশি অপরাধ বর্জনের মত স্পৃহাও তৈরী করেন মানুষের ভেতর। সে স্পৃহা বলে তারা অন্যায় চাহিদাকে পরাজিত করতে পারে। যার বলে নবীদের অনুসারীরা তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে পারেন। সে মাফিক জীবন গড়তে পারেন। তাদের হৃদয় তাদের অভিভাবকত্ব করে। অন্যায় কর্মে বলিষ্ঠ হতে বাধা প্রদান করে।

সর্বকালের সকল নবী তাঁর অনুসারী জাতিকে এ তিনটি সম্পদ দান করেছেন। এ শক্তির পরশেই লক্ষ কোটি মানুষ পথের সন্ধান পেয়েছে। জীবন বদলে গেছে তাদের। তাই মানবতার প্রতি সত্যিকার অর্থে যদি কেউ করুণা করে থাকে সেটা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম করেছেন। তারা মানবতাকে পথ দেখিয়েছেন। তাদেরকে যথা সময়ে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে পৃথিবী এ সম্পদই হারাতে বসেছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান নেই। বিশ্বাসের প্রদীপও নিভে গেছে। সৎকর্মের আগ্রহ আজ কবরবাসী। খৃষ্টাব্দ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এসে মানবতার এ তিন সম্পদ এত দুর্লভ হয়ে পড়েছিল -তার ঠিকানা পাওয়াও ছিল মুশকিল। কোথাও এসবের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। দেশের পর দেশ খুঁজে এমন একজন আল্লাহর বান্দা পাওয়া যেত না যার নিকট সঠিক জ্ঞানের আলো আছে। এমন কোনো আদম সন্তান পাওয়া যেত না, যার আত্মায় বলিষ্ঠ ঈমান ও বিশ্বাস আছে। নবীগণ যে দীন ও বিশ্বাস নিয়ে আগমন করেছিলেন তা সংকুচিত হতে হতে এক বিন্দুতে এসে দাড়িয়ে ছিল। বর্ষাভেজা আধার রাতের ঝোনাকীদের সংশয় ও অপরাধের অন্ধ জগতের কোথাও ঝলকে উঠত সেই আসমানী আলো। ঈমান ও বিশ্বাসের সে এক দুর্ভিক্ষ কাল। সে কালে একজন দুর্বার বিশ্বাসীর সন্ধান ও সংস্পর্শ ছিল স্বপ্নসম। সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বিশ্বাস ও সততার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। ইরান থেকে সিরিয়া, সেখান থেকে হিজায পর্যন্ত সফর করে মাত্র চার জন বিশ্বাসীর সাক্ষাত পেয়েছিলেন তিনি।

এ নিশ্ছিদ্র আধার আর আবিশ আচ্ছাদিত তমসার জগতেই আবির্ভাব হলো সর্বশেষ নবীর। তিনি এলেন। জ্ঞান, বিশ্বাস ও সৎকর্মের প্রতি অগাধ স্পৃহার মশাল হাতে করেই এলেন। আর তা এমনভাবে ঘোষণা করলেন। এত ব্যাপক প্রচার করলেন যে, অল্প সময়ের ব্যবধানে সে আলো মহল্লা, শহর ও রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল।

তিনি এসে কেবল জ্ঞান, বিশ্বাস আর আদর্শের শিক্ষাই দেন নি শুধু, মানুষের মধ্যে এ সবের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। বরং সে ছিল এক শিঙ্গার ধ্বনি। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের কোনো কান বলতে পারবে না, এ আওয়াজ আমি শুনি নি। যদি কেউ এর দাবী করে এটা তার সংকীর্ণতা। আহ্বানকারীর সীমাবদ্ধতা বা সংকীর্ণতা নয়।

পৃথিবীতে কি আজ এমন আবাদ ভূমি আছে যেখানে 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশ হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'-এর ধ্বনি উচ্চারিত হয় না? পৃথিবীর সকল কণ্ঠ যখন ম্লান-অবসন্ন হয়ে পড়ে, জাগ্রত সকল শহরে যখন ঘুমের নিরবতা নেমে আসে, সর্বত্র যখন বাক-বিরতির গাঢ় নিস্তব্ধতা, তখনও কান পেতে দিন, কান ময় আলোড়িত হবে সেই সুর -আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরই রাসূল।

রেডিওর মাধ্যমে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে যে কোনো কথা দেশ থেকে দেশান্তরে। আহ্বান পৌঁছে যায় মানুষের ঘরে ঘরে। কিন্তু আমেরিকা কিংবা বৃটেনের কোনো রেডিও কি আজ পর্যন্ত তাদের কোনো বক্তব্যকে এতটা ছড়াতে পেরেছে যতটা ছড়িয়েছে এ আহ্বান? অথচ এ আহ্বান আরবের এক নিরক্ষর নবীর। সাফা পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে একদিন তিনি উচ্চারণ করেছেন এ আহবান।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের যে শ্লোগান উচ্চারণ করেছিলেন, তার সুর ও আহ্বানে পৃথিবীর সকল ধর্ম, সকল দর্শন ও সকল চিন্তাই কম বেশী প্রভাবিত হয়েছে। তিনি সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের প্রভু মাত্র একজন। আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করা চরম অপমানের বিষয়। আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালাম-এর সামনে ফেরেশতাদের মাথা ঝুকিয়ে দিয়েছেন যাতে আদম সন্তানেরা আর কারো সামনে নিজেদের মাথা নত না করে এবং তারা যেন বুঝতে পারে, সৃষ্টির এ মহান গোষ্ঠির মাথাই যখন আমাদের সামনে অবনত, তখন আমরা তো পৃথিবীর কারো সামনে নত করতে পারি না আমাদের মাথা।

যেদিন থেকে পৃথিবীর মানুষ এ তাওহীদের মর্মকথা শুনেছে সেদিন থেকে শির্ক নিজে নিজেই লজ্জায় অবনত হয়েছে। পরাজয় বরণ করেছে নিজে নিজেই। মুহাম্মাদের কণ্ঠে উচ্চারিত তাওহীদ-একত্ববাদের সুর-ই ভিন্ন। এখানে তাওহীদের রয়েছে নিজস্ব ব্যাখ্যা। রয়েছে তার স্বতন্ত্র দর্শন। সেখানে তাওহীদ আত্মার গহীনে আশ্রয় পেয়েছে।

অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইলম ও বিশ্বাসের সাথে এমন এক শক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, যাতে সহস্র পুলিশ, অযুত-লক্ষ আদালত ও প্রশাসনের চেয়ে অধিক ক্ষমতা নিহিত। সত্যের প্রতি অনুরাগ, মন্দের প্রতি অনীহা আর জবাবদিহীতার আত্ম-উপলব্ধিই সেই শক্তি।

মূলতঃ এ চেতনা এ শক্তির বরকতে -এক সাহাবী পাপ কর্মে জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুশোচনায় অস্থির হয়ে পড়েন। কেঁপে উঠে হৃদয় তার গভীর বেদনায়। দৌড়ে আসে সে নবীর দরবারে। এসে নিবেদন করে, হে রাসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা ফিরিয়ে নেন। সে আবার মুখোমুখি

দাঁড়ায়, আরয করে, আমাকে পবিত্র করুন! রাসূল মুখ ফিরিয়ে নেন। সাহাবী আবার সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রিয় নবী খোঁজ-খবর নেন -সে আবার মানসিক রোগী নয়তো? জানতে পারেন, লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ। নবী তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রশ্ন হলো, কোন শক্তি তাকে শাস্তি গ্রহণে উৎসাহিত করল?

এখানেই কি শেষ? গামেদিয়া গোত্রের সেই নিরক্ষর নারীর কাহিনী শুনুন। সে নারী থাকত অজগাঁয়ে। একবার শয়তানের ফাঁদে পড়ে একটি পাপে জড়িয়ে পড়ল লোকচক্ষুর অন্তরালে। কেউ দেখে নি, শুনেও নি; কিন্তু হৃদয় তার দগ্ধ হল বিবেকের দংশনে। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিল না। এক রাশ তপ্ত জ্বালা তাকে তাড়া করে ফিরছিল। খানা-পিনা কিছুতেই তৃপ্তি নেই। খানা খেতে বসলেই খাবারই যেন তাকে প্রতিবাদ করে বলে, তুমি অপবিত্রা! পানির কাছে গেলে পানি তার আত্মায় আঘাত করে, তুমি অপবিত্রা। তার ভিতর রাজ্য ভরে একটি আওয়াজ সে শুনতে পায়, তুমি অপবিত্রা, তোমার আবার খানা-পিনার কি অধিকার? তোমাকে প্রথমে পবিত্রা হতে হবে। শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। শাস্তি ছাড়া তোমার বিকল্প পথ নেই। কী আর করবে সে? হাযির হয় নবীর খেদমতে! আবেদন জানায় আমাকে শাস্তি দিন। আমাকে পবিত্রা করে দিন। নবী খোঁজ নেন। জানতে পারেন, তার গর্ভে সন্তান আছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আচ্ছা, তুমি না হয় পাপ করেছো; কিন্তু গর্ভের সন্তানটির কী অপরাধ? তার জন্ম হবে যখন, তখন আসবে।

প্রিয় পাঠক! একবার ভাবুনতো। সন্তান প্রসব হতে কি কিছু সময় খরচ হয় নি? এ সময় সে কি খানা-পিনা করে নি? খানা-পিনার স্বাদ, জীবনের রূপ-রস কি তাকে বাঁচার আহবান জানায় নি? সে তো আটক ছিল না। সে চাইলে কি নবীর দরবারে হাযিরা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারত না? কিন্তু আল্লাহর এ বাঁদীর অবস্থা দেখুন! সে তার সংকল্পে স্থীর।

কিছু দিন পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে হাযির। বিনীত কণ্ঠে আওয়াজ করছে হে রাসূল! আমি তো অবসর হয়ে গেছি। এখন আর দেরী কেন, আমাকে পবিত্রা করে দিন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না, না, তাকে দুধ পান করাতে হবে না? সে যখন দুধ ছাড়বে তখন এসো। সকলেই জানে এতে আরো দু'বছর সময় বেড়ে গেল। কত কঠিন পরীক্ষা কাল এটা। কোনো পুলিশ নেই। কোনো পাহারাদার নেই। মুকাদ্দামা নেই। মুচলেকা নেই। জামিন-জামানত কিছুই নেই। এ সময় জীবনের কত চিত্র সে দেখেছে। কল্পনার আকাশ জুড়ে কত স্বপ্ন উড়েছে। অবুঝ নিষ্পাপ শিশুর হৃদয়কাড়া অবয়ব, নিবিড় শান্তির হাসির পল্লব। আর নিঃশব্দ উচ্চারণ- মা, আমিতো তোমার কোলেই বড় হব-মা! তোমার হাত ধরে হাঁটব। ঝাপিয়ে পড়ব সুখে-দুখে তোমারই বুকে।

এ আহ্বান কি উপেক্ষা করা যায়? কিন্তু তার হৃদয় বলছে, তুমি নাপাক। তুমি অপবিত্র। তোমাকে পবিত্র হতে হবে। হৃদয় তাকে শাসন করছিল, তোমাকে না একদিন আহকামুল হাকেমীনের কাছে দাঁড়াতে হবে শেষ বিচারের দিনে। সে দিনের শাস্তি কিন্তু ভয়ানক।

হৃদয়ের শাসনকে উপেক্ষা করতে পারল না সে। তাই সে হাযির হল নবীজির দরবারে। কোলে নিষ্পাপ শিশু। শিশুর মুখে তুলে দিয়েছে এক টুকরো রুটি। এসে আরজ করল, হে রাসূল! আমার সন্তান রুটি খেতে শিখেছে। দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। আর দেরী নয়। এবার আমাকে পবিত্র করে দিন।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলার এ মুখলিস, মুহসিন বাঁদীকে শাস্তি দেওয়া হল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সৌভাগ্যের সনদ দান করেন। বললেন, আল্লাহ তাঁর এ বাঁদীর তাওবা এমনভাবে কবুল করেছেন, যদি তার এ তওবা মদীনাবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে তা সকলের নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

আমি বলি, এমন কি বিষয় ছিল, এমন কোন শক্তি ছিল যা তাকে কোনো ধরনের হাতকড়া, মুচলেকা ও অন্যান্য জামানত ছাড়াই আদালতে হাযির হতে বাধ্য করেছিল? কোন সেই অদৃশ্য ক্ষমতা যা তাকে পুলিশের পাকড়াও ছাড়াই মাথা পেতে শাস্তি নিতে বাধ্য করেছিল? আজকের পৃথিবীতে তো শিক্ষিত লোকের অভাব নেই। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পান্ডিত্যের চূড়া স্পর্শ করেছে অনেকেই; কিন্তু তাদের জ্ঞান, তাদের পাণ্ডিত্য কি তাদের অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারছে? গভীর বিদ্যা আর বিশ্বাস কি তাদেরকে মঙ্গল কাজে ব্যাপৃত করতে পেরেছে? নিশ্চয় পারছে না।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীকে এ তিনটি অমূল্য সম্পদ দান করেছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞান, দৃঢ় বিশ্বাস আর কল্যাণ ও সৎ কর্মের প্রতি আন্তরিক টান বা শক্তিমান আকর্ষণ।

আজ অবধি পৃথিবীকে কেউ এর চাইতে দামী কোনো কিছু দিতে পারে নি।এবং নবীজির চেয়ে অধিক অনুগ্রহ কেহ করতে পারে নি।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকেই অহংকার করা উচিত। আমাদেরই একজন মানুষ এ নিখিল ভূবনে মানবতার মাথা উঁচু করেছেন। আমাদেরই স্বজাতি এক আরব সন্তান গোটা মানবজাতির নাম আলোকিত করেছেন। তিনি যদি আগমন না করতেন তাহলে এ পৃথিবীর কি দশা হত? আর আমরা মানব জাতির গর্ব অহংকার করার-ই বা কোনো উপায় থাকত কি?

নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানব জাতির গর্ব। তিনি এ পৃথিবীর এক চিরন্তন আলো, মানব জাতির অনন্ত গৌরব। তিনি বিশেষ কোনো জাতির নন, বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের নন, বিশেষ কোনো দেশের সম্পদও নন তিনি, বরং তিনি সমগ্র মানবতার সম্পদ। আবিশ্ব মানব জাতির হৃদয়ের ধন তিনি। আজ পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো নাগরিক অনন্ত গর্ব আর অসীম আনন্দ ভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারে, আমি সেই মানুষ -যে মানুষরূপে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত ব্যক্তিত্ব এ পৃথিবীতে এসেছিলেন।

আজকের পৃথিবীতে এমন কোনো মানব শ্রেণী আছে, যাদের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগ্রহ নেই? নারী, পুরুষ, শিশু, দুর্বল-সবল, গাছ-পালা, পশু-পাখী কার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ নেই?

সব পেশার মানুষের প্রতিই তার অনুগ্রহ জানতে সীরাতের গ্রন্থগুলো অধ্যায়ন করুন। দেখবেন, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, শাসক, শাসিত কে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে?

সমগ্র পৃথিবীর প্রতি তাঁর অনুগ্রহ স্বল্প কোথায়? তিনিই তো সর্ব প্রথম ঘোষণা দিলেন: আল্লাহ কোনো বিশেষ জাতি, গোষ্ঠী কিংবা বিশেষ কোনো দেশের নন; বরং আল্লাহ তা'আলা সারা জাহানের এবং সমগ্র মানবগোষ্ঠীর।

যে পৃথিবীতে আর্যদের দেবতা, ইয়াহূদীদের দেবতা, মিসরীয়দের দেবতা ও ইরানীদের দেবতা বলে সৃষ্টিকর্তাকে সংকীর্ণ বলয়ে আবদ্ধ করে রাখা হত, সেই পৃথিবীতে তিনিই ঘোষণা করলেন :

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢﴾ [الفاتحة: ٢]

“প্রশংসাসমূহ জগতসমূহের রব আল্লাহরই জন্য।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ২]

অনন্তর এ ঘোষণাকে সালাতের অংশ হিসাবে নির্বাচন করলেন। এ পৃথিবীতে অনেক দার্শনিক এসেছেন, বিজ্ঞানী এসেছেন, কবি-সাহিত্যিক এসেছেন, যোদ্ধা, দেশ-বিজেতা, রাজনীতিক, আবিস্কারক কতজনই তো এসেছেন; কিন্তু নবীগণের আগমনে পৃথিবীতে যে বসন্ত এসেছে তা কি অন্য কারো আগমনে এসেছে?

অনন্তর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনে পৃথিবীতে সৌভাগ্য, কল্যাণ, রহমত, বরকত, শান্তি ও মানবতার যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে, তা কি অন্য করো আগমনে ঘটেছে? ঘটে নি। কারণ, মানবতাকে তিনি যা দিয়েছেন তা আর অন্য কেউ দিতে পারে নি।

সমাপ্ত